# জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে উপকূলীয় নারী

মোঃ রমজান আলী

উন্নত বিশ্বের নারী যখন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য নভোচারী প্রশিক্ষণ করছে, তখন আমার উপকূলের কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারী সন্তান প্রসবের জন্য ২ ঘণ্টার নদী পথ পাড়ি দেওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন; সুস্থভাবে বাচ্চার জন্ম হবে তো! তিনি নিজে বাঁচবেন তো! নাকি অন্যদের মতো প্রসব-পরবর্তীকালীন জটিলতা বয়ে বেড়াবেন আজীবন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হচ্ছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীসমাজ- বিশেষত গর্ভবতী, দুগ্ধদায়ী মা ও কিশোরীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুপেয় পানির সংকট, অপুষ্টি ও মানসিক চাপ তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, লক্ষিপুর, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক স্থানে পানযোগ্য পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারীর মৌলিক চাহিদার ওপর। পরিবারে পানির যোগান, রান্না, সন্তান লালন-পালন ও দৈনন্দিন গৃহকর্মে প্রধান ভূমিকা পালন করেন নারীরা। ফলে পানির সংকট, খাদ্যাভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত তারা সরাসরি বহন করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন লবণাক্ত পানি পান করার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূতি জটিলতা, ত্বকজনিত রোগ ও কিডনি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা সমভূমির নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি পান করলে প্রি-এক্লাম্পসিয়া ও এক্লাম্পসিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগ দেখা দিতে পারে, যা মা ও নবজাতকের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া লবণাক্ত পানিতে গোসল করার কারণে অনেক নারীর ত্বক পুড়ে যায়, চুল পড়ে যায় এবং চুলকানিসহ নানা চর্মরোগে ভোগেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লবণাক্ত মাটি ও পানির কারণে ধান, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন কমে গেছে। ফলে খাদ্যে বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে অপুষ্টি। অপুষ্টি নারীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে রক্তশূন্যতা ও অকাল বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির অভাব এখন একটি বড়ো স্বাস্থ্যঝুঁকি। লবণাক্ত পানির কারণে টিউবওয়েল ও পুকুরের পানি প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ছে। নারীরা প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে। এই পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, শরীরিকচাপ এবং ভারি জলের পাত্র বহন করার ফলে কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, এমনকি গর্ভপাতের মতো জটিলতা দেখা দেয়। এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের পর যখন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়, তখন পর্যাপ্ত টয়লেট ও স্যানিটেশন না থাকায় নারীদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা দুটিই হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় মেয়েরা রাতে টয়লেট ব্যবহারের ভয়ে পানি না খেয়ে থাকে, ফলে তাদের প্রস্রাবের সংক্রমণ ও কিডনি সমস্যা দেখা দেয়।

জলবায়ু বিপর্যয়ে নারীরা শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকে বড়ো আঘাত পায়। ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু বা আম্পানের পর বহু নারী তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও প্রিয়জন হারিয়েছে এবং দুর্যোগে বহু পুরুষ শহরমুখী শ্রমবাজারে চলে যায়, ফলে তখন তাদের কাঁধে পড়ে পরিবার টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব। এ চাপ, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার কারণে অনেক নারী হতাশায় ভোগেন। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের মধ্যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ও ট্রমাজনিত মানসিক ব্যাধির হার ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ পর্যায়ে প্রায় অনুপস্থিত। সামাজিক কাঠামো ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চনা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাদের সংকটে ফেলে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় অনেক নারী সংস্কার বা লজ্জা-সংকোচে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান না, ফলে প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকায় জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত প্রায়শই উপেক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব মোকাবিলায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সালে প্রণীত এবং ২০২০ সালে হালনাগাদ করা "Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)" দেশের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমের মূল ভিত্তি। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষত নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। লবণাক্ততার কারণে টিউবওয়েল ও পুকুরের পানির সমস্যার সমাধানে সরকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ট্যাংক ও সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হচ্ছে। আর্সেনিক ও লবণমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা হচ্ছে উপকূলীয় ইউনিয়নগুলোতে। স্কুল ও

আশ্রয়কেন্দ্রে নারীবান্ধব টয়লেট ও স্যানিটেশন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। “Safe Water Supply in Coastal Belt Project” নামে একটি বিশেষ প্রকল্প বর্তমানে খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলায় চলমান। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় উপকূলীয় এলাকায় Climate Resilient Health System গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করেছে। সাইক্লোনপ্রবণ অঞ্চলে মোবাইল মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে, যারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে মাঠপর্যায়ে চিকিৎসা প্রদান করে। প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশুবান্ধব স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রসূতি ও জরুরি চিকিৎসা সেবা (EmOC) নিশ্চিত করতে দক্ষ ধাত্রী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে জলবায়ু অভিযোজন নির্দেশিকা চালু করেছে, যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিবেশ-সম্পর্কিত রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও Gender Action Plan on Climate Change অনুসারে নারী ক্ষমতায়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে, যেমন উপকূলীয় নারীদের জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রশিক্ষণ, লবণ-সহনশীল ধান, সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন। স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্বে কমিউনিটি সচেতনতা দল (Women Climate Forum) গঠন। মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি। এনজিও ও সরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল, যা জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তার “Standing Orders on Disaster (SOD)”–এ নারীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক নির্দেশনা যুক্ত করেছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নারীস্বাস্থ্য কর্ণার চালু করা হয়েছে, যেখানে নারী চিকিৎসক ও ধাত্রী দায়িত্ব পালন করেন। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে স্যানিটারি সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময় মোবাইল ক্লিনিক ও ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, যেখানে নারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টি পরামর্শ দেওয়া হয়। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে অনেক নারী পরিবার ও সম্পদ হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকার সম্প্রতি Community Mental Health Programme চালু করেছে। উপকূলীয় জেলা হাসপাতালগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন এবং ট্রমা–ভুক্তভোগী নারীদের কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সরকার জলবায়ু-স্বাস্থ্য অভিযোজনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। UNDP, WHO ও FAO–এর সহায়তায় চলছে “Health Adaptation to Climate Change in Bangladesh” প্রকল্প। Green Climate Fund (GCF) ও World Bank–এর অর্থায়নে উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সহনশীল হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ হচ্ছে। “Coastal Embankment Improvement Project (CEIP)”–এর মাধ্যমে উপকূলীয় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা জোরদার করা হয়েছে। নারী ও পরিবার পর্যায়ে জলবায়ু সচেতনতা গড়ে তুলতে সরকার একাধিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে—কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নারীস্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পুষ্টি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন চালু। স্কুল পাঠ্যক্রমে পরিবেশ ও জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে মেয়েরা ছোটোবেলা থেকেই সচেতন হয়। স্থানীয় রেডিও ও টেলিভিশনে নারীস্বাস্থ্য ও জলবায়ু সচেতনতা বার্তা সম্প্রচার করা হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তে জলবায়ুজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলার নির্দেশনা যুক্ত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১–২০২৫) নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজনকে অন্যতম কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP 2023) উপকূলীয় নারীদের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী-কেন্দ্রিক নীতি অপরিহার্য। নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো অভিযোজন কৌশল সফল হতে পারে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়- বর্তমানের একটি কঠিন বাস্তবতা। এর প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় নারীদের জীবনে। তারা প্রতিদিন লড়ছেন দারিদ্র্য, লবণাক্ততা, অপুষ্টি, সুপেয় পানির সংকটের সাথে, অন্যদিকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করছে। তবে, নারীরাই আবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক। যতদিন তারা দৃঢ় মনোবলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, ততদিন উপকূল টিকে থাকবে জীবনের আশায়। এই সংগ্রামকে টেকসই করতে হলে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন। কেননা, উপকূলের নারী শুধু ভুক্তভোগী নয়-তিনি পরিবর্তনের অগ্রদূত। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি, সরকারি পদক্ষেপ ও স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগগুলো ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে।

#

লেখক: সহাকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

পিআইডি ফিচার